ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালীন বাংলা উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা।"[১]

বাংলা সাহিত্যে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমানেও অনেক লেখক নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত বা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকথা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করছেন। কিন্তু, এত সংখ্যক ঔপন্যাসিক এবং তাঁদের উপন্যাসের মধ্যেও দিব্যেন্দু পালিত আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। দিব্যেন্দু পালিত মূলত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের সংকট, হতাশা, নরনারীর দাম্পত্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, স্বপ্ন ও ব্যর্থতা, অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো ঔপন্যাসিককে এতোটা দীর্ঘ সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের স্তরকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করতে দেখা যায়নি। সুতরাং দিব্যেন্দু পালিত বাংলা উপন্যাস জগতে স্বতন্ত্র আসন পাবার যোগ্য দাবিদার।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্যান্য ঔপন্যাসিক বিশেষকরে মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-), একটু বয়সে বড়ো বিমল কর (১৯২১-২০০৩), রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) প্রমুখদের রচনায় মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে দিব্যেন্দু পালিতের সমকালীন, কিছু আগে কিংবা পরের কয়েকজন ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্রতার পরিচয় তুলে ধরা হবে। যেমন, রমাপদ

চৌধুরীর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত মানুষের নানা ভাঙা-গড়ার সাক্ষ্য রয়েছে। ১৯৬২ সালে লেখা তাঁর 'আরো একজন' উপন্যাসে দেখা যায় আপাত সুখী সচ্ছল দাম্পত্য জীবনের গোপন রন্ধ্রপথ দিয়ে তৃতীয় একজনের ঢুকে পড়া, পুরুষের বহুগামিতা, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন-সংসর্গ ইত্যাদি বিষয়। আবার মতি নন্দীর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯), 'দ্বাদশ ব্যক্তি' (১৯৭০) ইত্যাদি উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন সংকট ধরা পড়ে, তেমনই আবার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'একক প্রদর্শনী' (১৯৭০), 'এখন আমার আর কোনো অসুখ নেই' (১৯৭৬) ইত্যাদিতে আতঙ্ক, মৃত্যুভয় বা হতাশা মধ্যবিত্ত জীবনকে নানভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে অসুখী দাম্পত্য, অবাধ যৌনতা, বহুগামিতা বড়ো জায়গা করে নিয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে বহুগামিতার প্রসঙ্গ এসেছে একটা সংকট থেকে। আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রেম-যৌনতা এসেছে সাময়িকভাবে। আবার বিমল করের রচনায় মৃত্যুভয়ের চিত্র আছে, কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে মৃত্যুভয় নেই। পরিবর্তে দিব্যেন্দু পালিতের রচনায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বেঁচে থাকার তীব্র লড়াই চালিয়েছে তাঁর চরিত্ররা।

সাতের দশকের যুদ্ধ, বামপন্থীদলের অন্তর্বিরোধ ও ভাঙন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ইত্যাদি স্বাধীনতা-পরবর্তী সামাজিক অবক্ষয়ের চেহারাটাকে আরো বেশি করুণ করে তুলেছিল। ফলে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের বিক্ষোভ ও কষ্ট, মেরুদণ্ডহীন সমাজব্যবস্থার নঞর্থক আগ্রাসী শক্তির নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিল সাধারণ মানুষ। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার অনিবার্য প্রতিফলন এসেছিল। যে ব্যক্তি এতোদিন তার চারপাশের সমাজকে দেখছিল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, সে এখন নিজেকে দেখতে শুরু করেছে। এই দৃষ্টি বদলের প্রাথমিক দায়িত্ব বহন করেছিলেন বিমল কর। তিনি ব্যক্তিমানুষের মনের গভীরতর কথাকে সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি গল্প-উপন্যাসে নতুন রীতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্ব-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছে। তাঁর রচনায় স্বীকারোক্তির পথে, চেতনায় মগ্ন ভাবপ্রবাহের পথে প্রকাশিত হয়েছে সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্য। আর সেই সঙ্গে মানুষের অন্তর্লোকের উদ্‌ঘাটন। এক জটিল সূত্রে গ্রথিত অন্তর ও বাহিরের প্রকাশ ঘটে। 'দেওয়াল' উপন্যাসে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভেঙে যাওয়া সমাজে নৈতিক পতন ও মূল্যবোধের ভাঙনের মধ্যে একটি নিম্নবিত্ত পরিবার কীভাবে বেঁচে থাকতে চাইছে তারই ছবি

তুলে ধরেছেন। চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের ন্যায়-নীতি, প্রেম-ভালোবাসা বেঁচে থাকে। সুধা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। পিতৃহীন সংসারের সব দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। চারিদিকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যে একদিকে সুধা নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে চায়, অন্যদিকে তার মনের সহজ শুদ্ধ প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা রাখতে চায়। সে সুচারুকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসাটুকু নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়। নিরন্ন পরিবারের সমস্ত ভার বহন করে সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই শারীরিক ব্যাধি কিন্তু তার মনে ছড়ায়নি। তাই একদিকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, অন্যদিকে প্রেমিকের কাছে ফিরে যাবার বাসনা— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সুধার ভিতরে এক অদ্ভুত সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সত্তার এই সংকটে ক্ষতবিক্ষত সুধা অবশেষে প্রেমিককেই গ্রহণ করার জন্য রাজি হয়েছে। সুধার প্রেম এখানে জয়লাভ করেছে। সুধার বাঁচার আগ্রহই বড়ো হয়ে উঠেছে—

> "আমার খুব একটা মোহ আর কিছুতেই নেই... কিন্তু মায়া আছে। বাঁচার ইচ্ছেও। মরে না যাওয়া পর্যন্ত বাঁচতে হবে।"[২]

সুধার প্রেমিক সুচারুও যুদ্ধে গিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়লে সুধার কাছে ফিরে এসেছে। যে যুদ্ধে জীবন দেওয়ার জন্য তৈরী ছিল, সে এখন সুধার প্রেমের প্রতি প্রবল আগ্রহ নিয়েই জীবনে বেঁচে থাকার সংকল্প নিয়েছে। আর সুধার ভাই বাসু তার ভিতরের পাপবোধকে ধিক্কার জানিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। নিজেকে সে শুদ্ধ করতে চায়। এই শুদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা, আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা। কথাশিল্পী বিমল কর এখানে আধুনিক মানুষের মূল্যবোধের নানা রূপান্তরকে তুলে ধরেছেন। দিব্যেন্দু পালিত কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে কোনো উপন্যাস রচনা করেননি।

বিমল করের 'অপরাহ্ন' উপন্যাসটির সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের 'আড়াল', 'অবৈধ', 'স্বপ্নের ভিতর', 'অনুভব' প্রভৃতি উপ্যনাসের ভাবগত কিছুটা মিল আছে। নারীপ্রধান এই উপন্যাসগুলিতে বিমল কর ও দিব্যেন্দু পালিত মেয়েদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অপরাহ্ন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কমলা। চল্লিশোত্তর বয়সে সে এক সমস্যার মুখোমুখি হয়। স্বামী-বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা কমলা জীবনে বহু সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে কন্যা অরুণা ও পুত্র কল্যাণকে নিজের মতো মানুষ করতে চায়। সে সেবিকার কাজ করলেও আত্মসম্মান নিয়ে সংসারে বেঁচে থাকতে চায়। সেই কমলার ভিতরে সন্তানের প্রতি মমতার

পাশাপাশি প্রেমসত্তাও দেখা দেয়। তার মাতৃসত্তার থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে নারীসত্তা। সে সত্তা পুরুষের সান্নিধ্য কামনা করে। দিব্যেন্দু পালিতের উপরিউক্ত উপ্যনাসগুলিতেও মাতৃসত্তার থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে নারীসত্তা। রুচি, জিনা, অর্পিতা, বিশাখা কিংবা আত্রেয়ী— এরা পত্নীত্বে বা মাতৃত্বে নয়, নারীত্বেই খুঁজতে চেয়েছে তাদের ঠিকঠাক পরিচয়। এই খোঁজা 'অপরাহ্নে'র কমলার ক্ষেত্রেও যেমন সর্বাংশে সফল হয়নি, তেমনি দিব্যেন্দু পালিতের মেয়েদের ক্ষেত্রে সফল হয়নি। যৌবনে কমলা স্বামীর প্রেম-ভালোবাসা পায়নি। তাই তার বুভুক্ষু মন প্রায় প্রৌঢ় বয়সে এসে অবিনাশকে গ্রহণ করতে চায়। কমলার এই প্রেম পরিবারের সকলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তখন সে সকলের অমর্যাদার পাত্রী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দিব্যেন্দু পালিতের 'অবৈধ' উপন্যাসের জিনাও স্বামীর ভালোবাসা না পেয়ে প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রণয়ীর দ্বারা জিনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতো মিল থাকা সত্ত্বেও দুজন লেখকের মধ্যে চরিত্রকে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। একদিকে সন্তানদের প্রতি তীব্রটান, অন্যদিকে প্রেমিক পুরুষ অবিনাশের প্রতি মোহ কমলার মনে এক জটিল সংকটের সৃষ্টি করেছে। কমলার নিঃসীম যন্ত্রণা আত্ম-অন্বেষণের ভিতর দিয়ে মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে কমলা একা, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। অপরদিকে জিনা স্বামী অসীম ও প্রেমিকপুরুষ পার্থ— এই দুই পুরুষের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়। স্বামী ও প্রণয়ীর দ্বারা বৈধ ও অবৈধভাবে 'ব্যবহৃত' জিনা তাই অবলম্বন হতে চায় বিকলাঙ্গ শিশুদের। সে ক্রমশ আত্মধিক্কারে নিজেকে চিনেছে। এভাবে দিব্যেন্দু পালিতের নারী চরিত্ররা আত্মবিশ্বাসে টিকে থেকেছে। মেয়েরা বেঁচে থাকার জন্য স্বনির্ভর হয়েছে। স্বামী-সংসার-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকবার জন্য আলাদা জমি খুঁজেছে। এক ধরনের অদম্য আত্মবিশ্বাস তাদের পৌঁছে দিয়েছে কোথাও, যেখানে তারা অন্যের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারে সাহায্যের হাত। এখানেই বিমল করের সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের পার্থক্য।

বিমল করের 'খোয়াই', 'কেরানী পাড়ার কাব্য' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রকরণের চমক দেখা যায়। তাঁর স্বকীয়তা দেখা যায়— 'খড়কুটো', পূর্ণ-অপূর্ণ', 'গ্রহণ', 'পরিচয়', 'ভুবনেশ্বরী' প্রভৃতি উপন্যাসে। বিমল কর অবিরাম জীবনের সন্ধান করে গেছেন। জীবন কী? জীবন কেন? জীবনের কেন্দ্রবিন্দু কোথায়? কোন আদর্শ থেকে শুরু হচ্ছে জীবন? শেষ হচ্ছে কোন পূর্ণতায়? এসব প্রশ্ন তাঁকে মথিত করেছে। আত্মমুখি মৃত্যুচিন্তাগ্রস্ত প্রশ্নকুশলী বিমল করের উপন্যাসে জীবন অন্বেষণ পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। 'পূর্ণ-অপূর্ণ' (১৯৬৭) উপন্যাসে তিনি

মানুষের জীবনে পূর্ণতার সন্ধান করেছেন। মানুষের জীবন অপূর্ণ। স্বভাবতই তার যাত্রা পূর্ণতার দিকে। মানুষ কীভাবে সে পথে যাবে? তার জীবনে এতো জটিলতা ও মালিন্য এসে গেছে যে তার ফলে জীবনে অবিশ্বাস আর ঘৃণারই প্রাধান্য। ফলে চোখের সামনে ভালোবাসাকে ক্ষয়ে যেতে দেখেও মানুষ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণের সন্ধান একালের মানুষকে কে দেবে? সাহিত্যিক বিমল কর তা দিতে চেয়েছেন এই উপন্যাসে। সুরেশ্বর, অবনী, ললিতা, হৈমন্তী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যদিয়ে লেখক পূর্ণতার অন্বেষণ করেছেন। এরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিজীবনে আঘাত প্রাপ্ত মানুষ। উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ পেরিয়ে তারা এমন এক স্তরে উপনীত যেখানে রোমাঞ্চ নেই, রহস্য নেই, পরিবর্তে আছে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ। পরিণত মানুষের অস্তিত্ববোধ হয় এই দায়িত্ব-কর্তব্যভিত্তিক সংযত ভালোবাসায়।

আবার 'গ্রহণ' উপন্যাসে বিমল কর মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল সম্পর্ককে রূপায়িত করেছেন। উপন্যাসের প্রধান চারটি চরিত্র পারস্পরিক জটিল সম্পর্কে আবদ্ধ। সেই জটিল সম্পর্ককে তারা ছাড়াতে চায়, কিন্তু পারে না। লেখক এভাবেই মানবজীবনের পর্যালোচনা করেছেন। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিত নরনারীর সম্পর্কের জটিলতাকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বিশেষকরে বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয়। দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাবার পর চরিত্ররা নিজেদের কথা ভেবেছে। নিজেদের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা ভেবেছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় মানসিকতা ধরা পড়েছে। স্ত্রী ঘরের বাইরে বের হলেই তাদের সন্দেহ করেছে। কিন্তু নারীরা পুরুষের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায়নি। তারাও বিশাল বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

রমাপদ চৌধুরীও কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হলো— 'লালবাঈ' (১৩৬৩), 'আরো একজন' (১৩৬৯), 'বনপলাশির পদাবলী' (১৯৬২), 'পরাজিত সম্রাট' (১৯৬৬), ' এখনই' (১৩৭৬), 'খারিজ' (১৯৭৪), 'লজ্জা' (১৩৮৩), 'সাদা দেওয়াল' (১৯৯৪) প্রভৃতি। রমাপদ চৌধুরীর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' (১৩৬১)-এ ছেলেবেলায় কাটানো রেলশহরের জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। পরিণত বয়সে ট্রেনে যেতে যেতে উপন্যাসের কথক আমি-র হঠাৎই দেখা হয়েছে এক বাল্যসঙ্গিনীর সঙ্গে। উপন্যাসে শেষপর্যন্ত কথক তাকে চিনতে না পারলেও কথায় কথায় সে-ই জাগিয়ে তুলেছে তার শৈশব স্মৃতি। রমাপদ চৌধুরীর পরের উপন্যাস 'লালবাঈ'-এ

উঠে এসেছে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। উপন্যাসে অওরঙ্গজেবের শাসনাধিনে বাংলাদেশের পটভূমিতে তিনি লালবাঈ, রঘুনাথ ও চন্দ্রপ্রভার কাহিনিকে রূপ দিয়েছেন। 'অরণ্যে আদিম' উপন্যাসে উঠে এসেছে ভারতবর্ষের যন্ত্রযুগের প্রেক্ষাপটে রামগড়, আরগাতা প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্যের জীবনকথা। দিব্যেন্দু পালিত এইরকম ইতিহাস কিংবা অরণ্যজীবন নিয়ে উপন্যাস লেখেননি। পরবর্তীকালে রমাপদ চৌধুরী বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত জনমানসকেই তুলে ধরেছেন। যদিও 'বনপলাশির পদাবলী' গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। তবুও সেখানে মধ্যবিত্ত সমস্যাকেই মূল হিসেবে দেখানো হয়েছে। রমাপদ চৌধুরী এই মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে নিজেই বলেছেন—

> "দরিদ্র বা সমাজের দুঃখের কথা বললেই কি বেশি সমাজ সচেতন হওয়া যায়? নাকি আমরা নিজেরা মুখে তাদের জন্য দরদ উঠলে দিয়ে নিজের বালক ভৃত্যটিকে কিভাবে রাখি; সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে বেশি সমাজ সচেতন হওয়া যায়? আসলে আত্মদর্শন, একজন মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা বা অসহায়তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখায়। তবে মানুষের ভাল করার কোন শর্ত নিয়ে আমরা সাহিত্য করিনা। শিল্পকর্মটাই প্রধান। সাহিত্য আসলে লেখকের আত্মদর্শন এবং সমাজদর্শন।"[৩]

তাই 'খারিজ', 'বাহিরি', 'লজ্জা', 'বাড়ি বদলে যায়', 'ছাদ' প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'খারিজ' উপন্যাসে একটি শিশুশ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। শিশুটি যে পরিবারে কাজ করতো সেই পরিবারটি শিশুটির পিতার প্রতি সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে নিজেরা কীভাবে পুলিসের হাত থেকে, কোর্টের শাস্তির হাত থেকে বাঁচবে তার তাগিদেই যেন বেশি। বাড়িতে শিশুশ্রমিক রাখা নিষেধ জেনেও জয়দীপ ও অদিতি চাকর হিসেবে রেখে দিয়েছিল শিশুটিকে। বাড়ির মালিকের রান্নাঘরে ভেন্টিলেটর না লাগানোয় রাত্রে রান্নাঘরে দুর্ঘটনা বসত শিশুটির মৃত্যু হয় অথচ বাড়ির মালিক নিশিথবাবুও তার দায় নিতে চায় না। কথক জয়দীপের কথায় ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার রূপটি—

"মধ্যবিত্ত মানুষগুলো কি ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল। বড়লোকদের মতই। বিশ্বচরাচরে কোথায় কি অনাচার অবিচার চলছে সে বিষয়ে সব সময় সচেতন, শুধু নিজের গৃহকোণটির বেলায় একেবারে অন্ধ।"[৪]

'বাহিরি' উপন্যাসে মধ্যবিত্তের মুল্যবোধের অবক্ষয়ের আর একটি চিত্র দেখা যায়। পুরীতে রথযাত্রা দেখতে গিয়ে গল্পকথক সঞ্জয়ের মা দয়াময়ী ও বাবা সুধাময় দয়া করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন একটি ছোট্ট ভিখিরি ছেলেকে। তার নাম দেন বংশীধর। বাড়িতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুধাময় পড়াশুনা করার জন্য তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। তাদের দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা সেই ছেলেটি বড়ো চাকরি পেলে, ভালো জায়গায় গেলে তাদের যেন কোথাও বাঁধে। মধ্যবিত্ত সমাজ চায় না বা পারে না তাদের কাছে টেনে নিতে। 'দাগ', 'লজ্জা' উপন্যাসে দেখা যায় মধ্যবিত্ত সমাজের আর এক চিত্র। মধ্যবিত্ত সমাজ যে তাদের অসহায়তা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি সমস্ত কিছু গোপন করতে সদা ব্যস্ত তাই এই দুটি উপন্যাসে দেখা যায়। মফঃস্বলের ছেলে অনিমেশ কলকাতায় আসে পড়াশুনার জন্য। কলকাতার অ্যাডভোকেট পিশেমশাইয়ের বাড়িতে অনেকদিন থেকেও তাদের আপন হয়ে উঠতে পারেনি। সে যেন একজন আউটসাইডার। তাই পিসিমার বিবাহিত মেয়ে রেনু যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন সংসারে যে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে তা অনেক চেষ্টা করেও অনিমেশ জানতে পারেনি। রেনুর স্বামী অরুণের কাছে সে জানতে পারে রেনুর অস্বাভাবিক আচরণের কথা। এই একটি ঘটনাই নাড়িয়ে দেয় মধ্যবিত্ত সমাজের সৌখিন মানবতাবোধকে। তাই অনিমেশ দেখে রেনুর পাগলামির কথা যাতে মক্কেলরা না জানতে পারে সে ব্যাপারে পিসেমশাই সচেতন। প্রতিবেশীরা যাতে কোনোভাবেই জানতে না পারে সেদিকে পিসিমা ভীত সন্ত্রস্ত। আবার টুনটুনও তার বন্ধুদের কাছে সাবধানী দিদির পাগলামির ব্যাপারে। যেন বাড়ির মেয়ের পাগল হয়ে যাওয়ার দুঃখ যন্ত্রণার চেয়ে বাইরের লোকের কাছে জানাজানি হওয়ার লজ্জা আরো বেশি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দিব্যেন্দু পালিতের 'অনুসরণ' এবং 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসদুটি আলোচনা করা যেতে পারে। এই দুটি উপন্যাসেও দেখা যায় মধ্যবিত্ত মানুষের লজ্জাকে ঢেকে রাখার গোপনীয়তা। 'অনুসরণ' উপন্যাসে এষা দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পর তার স্বামী অনীশ দত্ত কাউকে বিষয়টি বলেনি। সে পেশায় সাংবাদিক। ইচ্ছে করলেই

খবরটি সংবাদপত্রে দিতে পারত। কিন্তু না করে সে স্মৃতির মধ্যেই আচ্ছন্ন থেকেছে। অফিসের সহকর্মী কিংবা বাড়ির পরিচারিকা পর্যন্ত জানতে পারেনি। 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসেও একই ঘটনা ঘটেছে। ধীমান তার অপহৃত স্ত্রীর কথা একবারও ভাবেনি। তার স্ত্রীকে খোঁজার পরিবর্তে সে অন্য নারীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। নিজের স্বার্থপরতা, ভণ্ডামির পরিচয় দিয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতাসম্পন্ন চরিত্রগুলি রমাপদ চৌধুরী কিংবা দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এভাবেই ফুটে উঠেছে।

রমাপদ চৌধুরীর থেকে দিব্যেন্দু পালিতের স্বতন্ত্র ধরা পড়েছে চরিত্রগুলিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যে। দিব্যেন্দু পালিতের 'অনুসরণ' কিংবা 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসের অনীশ বা ধীমান শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থপরতা, পাপবোধ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। তারা এই জটিল যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আর রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের চরিত্ররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছে। কোথাও তাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে বা তাদের কাছে সাম্প্রদায়িক ভাবনা বড়ো হয়ে উঠেছে। যেমন 'ছাদ' ও 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসদুটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার অভাব ফুটে ওঠে। ভাড়াটে জীবনের নিরাশ্রয়তা প্রধান হয়ে ওঠে।

যে কঠিন কদাকার সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি বিধ্বস্ত, সেই সমাজের অখণ্ড ছবি না এঁকে সাহিত্যে শোনানো হয় দলিত বিধ্বস্ত মানুষের অন্তর্লোকের আর্তনাদ। বাইরের লোকসমাজ ও ঘটনা টুকরো টুকরো প্রতীকী হয়ে পড়ে এসময়। তবে তাতে ব্যক্তির মগ্ন চৈত্যন্যকে নাড়া দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সর্বজনীন কোনো অভিঘাত সৃষ্টি হয়নি। এই অভিঘাতের কথা শোনান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা। তাঁরা দেখিয়েছেন মানুষের স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। তাঁরা যে অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের স্বপ্নভঙ্গের কথা বলেছেন দিব্যেন্দু পালিতও সেই কথাই তুলে ধরেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে দেখা যায় যুবক-যুবতীরা জীবনের মানে খুঁজতে চেয়েছে নিজেদের মতো করে। তারা জীবনের অর্থকে একটা সংজ্ঞায় বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে। দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভেবেছিলাম'-এর কথক যুবকও এদের সমগোত্রীয়। নামহীন এই

যুবকেরও আশা ও আশাভঙ্গতাই মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনে, চাকরি জীবনে, এমনকি প্রেম জীবনেও সে সফল হতে পারেনি। জগৎ ও জীবন তার কাছে এক নৈরাশ্যতার সৃষ্টি করেছে। ছোটোবেলা থেকে জগৎ ও জীবনের প্রতি তার যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। যুবক বয়সে চাকরিহীনতায় বেকারত্বে তার দিন কাটে। কর্মহীন যুবকের কাছে পৃথিবীর সবকিছু তখন অন্ধকার হয়ে আসে। প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পারে না। পারে না নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়কার লেখকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন—

> "স্বপ্ন রচনা করার ক্ষমতা তাঁদের নেই, স্বপ্ন উপভোগ করার সময় তাঁদের নেই। তাঁরা জন্মেছে ভাঙা স্বপ্নের হাটে, তাদের চারপাশে বহু ভগ্ন মূর্তির জঞ্জাল।"[৫]

'সিন্ধু বারোয়াঁ'র সৌম্যও আপাত বেকারত্বের জ্বালায় বিয়ে করতে পারেনি। প্রেমিকা অরুন্ধতী বিয়ের কথা বললে সে পালিয়ে গেছে। সৌম্য নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। অরুন্ধতীর বিয়ের পর সৌম্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে। তার জীবনে অরুন্ধতীর প্রেম কোনো রাস্তা দেখায়নি। বিবাহ পরবর্তী জীবনে অরুন্ধতীও সুখী হতে পারেনি। একধরনের চাপা অভিমান নিয়ে সে বিভাসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বিভাসও বিবাহের পর যে সুখ পেতে চেয়েছিল তা কোনোদিনই পায়নি। আসলে প্রত্যেকটি চরিত্রই এখানে সময়ের অন্তর্ঘাতে লাঞ্ছিত। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে বলেছেন—

> "সময়ের হাত পড়েছে গত কয়েক বৎসরের বাংলা উপন্যাসে। ব্যক্তি ও সমাজের অন্বয়ে অনন্বয়ে, সংঘাতে ও সংযোগে ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে নানাভাবে। বাস্তবের সমস্যা ও শিল্পের সমস্যাকে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করে, স্বরমাত্রায় নানা লয়, নানা স্তর আরোপ করে লেখকেরা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন আজকের সময়ের, সমাজের তথা জীবনের চলচ্ছন্দকে। পাল্টে যাচ্ছে গল্প বলার, ধরতাই, বুনুনি ও বিন্যাসের ধারা ধরন।"[৬]

কবি সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের সব চরিত্রই আসলে একা। অর্থাৎ মূলকথা হয়ে ওঠে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব-

সংকটের প্রশ্ন। 'সন্ধিক্ষণ', 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'একা', 'সহযোদ্ধা', 'অনুভব' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীরা বিরূপ বিশ্বে একা হয়ে পড়েছে। কোনো এক স্বতন্ত্র প্রহরে, নিদ্রাহীন রাত্রিতে 'আমরা' উপন্যাসের নায়ক প্রিয়নাথের হঠাৎ মনে পড়ে 'ফুটপাথে বসে থাকা এক ফেক্‌লু জ্যোতিষীর কথা— 'তোমার জীবন খুব একার হবে'। দিব্যেন্দু পালিতের সমকালীন আর এক ঔপন্যাসিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা'র নায়ক শ্যামও এমন অস্তিত্বের প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছিল একসময়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে শ্যাম যেমন 'তবু পৃথিবী থেকে লোকজন ঢের কমে' গিয়ে 'আরো শালিক, চড়াই আর উড়িদে'র স্বপ্নই দেখে। দিব্যেন্দু পালিতের প্রিয়নাথ কিন্তু আদৌ তা নয়। সে অনেক বেশি মানবিক। সে রাস্তায় পথ হাঁটে। প্রিয়জনের সান্নিধ্য চায় আন্তরিকভাবেই। তাই একসময় উপন্যাসের সমাপ্তিতে 'ক্রমশ নির্জন হয়ে আসে রাস্তা।...দূর বেতারে সংযোগ স্থাপনের মতো একান্ত হাওয়ায় একটিমাত্র শব্দ ভাসে তার কানে, আস্তে আস্তে ঘুমের মতো ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আছি, আছি'।[৭] শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শ্যামের মতো বায়বীয় আদর্শবাদের প্রকোপ চারপাশের চেনাজানা পৃথিবীর ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা সবকিছুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বেদনায় সে বলেনি, আমি গাছ বা মাছ হয়ে জন্মালাম না কেন?

এই পটভূমিতে মতি নন্দী সমাজকে সম্পূর্ণ দূরে রেখে ব্যক্তির আত্ম-ক্রন্দন শোনাতে চাননি। বিগলিত সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির অস্তিত্ব তাঁর রচনায় অনুপ্রবেশের মতো। সেখানে ব্যক্তির কৌতুক ও করুণা, বেদনা ও অপমান, স্বপ্ন ও কামনার ব্যর্থতা, বাস্তব চিত্রের সংযম সমাজেরই দেহে ফুটে উঠেছে। অথচ সে সমাজে ব্যক্তি যেন অনাহুত। সমাজ ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করছে না। ব্যক্তি সেই বর্জনের পংক্তিতে কখনো পরাজিতের লাঞ্ছনায় বিপর্যস্ত। সেখানে পরাজিত পৌরুষের দীপ্তি বহ্নিমান। মতি নন্দীর প্রথম উপন্যাস 'নক্ষত্রের রাত' (১৯৫৮) পরিবারকেন্দ্রিক উপন্যাস। স্বাধীনতা পরবর্তী দশ বছর পরেরকার বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি এতে ফুটে উঠেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি দীনেশ ও তার স্ত্রী মাধবী আর তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নালিশ, অভাব, ভাড়াবাড়ির জীবন, পাওনাদারদের বিরক্তি, অদৃষ্টকে গালাগাল প্রভৃতি সমকালীন জীবনের ক্লান্তিবোধকে বহন করেছে। দীনেশ, মাধবী, তাদের ছেলেমেয়ে চিনু, রমা, মানু, অন্য ভাড়াটেরা— এরাই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এদের সম্পর্কসূত্রে আসে রাজা, সুখী, যমুনা, শৈল, বেকার চিনুর নার্স ট্রেনিং নিতে থাকা বান্ধবী কাবেরী। এই

উপন্যাসে মতি নন্দী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না গেলেও সময়ের দায়কে এড়াতে পারেননি। তাই ক্রুশেভের কলকাতায় আসার প্রতিক্রিয়া, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপন্যাসে আসে। যদিও তা কোনো বড়ো ভূমিকা নেয়নি।

পরবর্তীকালে মতি নন্দী অস্তিত্বের প্রশ্নকে আরো বিভিন্নভাবে দেখেছেন। 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯) উপন্যাসের হিরণ্ময় বলে—

> "আমি অপেক্ষা করেছি বহুদিন কিছু একটা ঘটাবার জন্য। কারণ আমি হাঁপিয়ে পড়েছি, আমি বদল চাইছিলাম এই নিত্যদিনের একঘেঁয়েমির থেকে। যখনই কলকাতায় কোনো কারণে পুলিস গুলি চালায় আমি রাস্তায় বেরিয়ে যেতাম এই আশায় একটু গুলি যদি গায়ে লাগানো যায়।"[৮]

তার এই চিন্তা আমাদের সামনে এক রুদ্ধশ্বাস মননের বিকৃত রূপ নেয়। উপন্যাসটিতে কয়েকটি পরিবারকে সামনে রেখে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যেও এই অস্তিত্বের প্রশ্ন আসে। লেখক এক পরিবারে দেখিয়েছেন বিধবা শেফালিকে, যে তার দাদা-ভাইয়ের সংসারে রান্না করে আর নানা বাড়ির সংবাদ সংগ্রহ ও বিতরণে বাঁচার অর্থ খুঁজে নেয়। আর এক পরিবারে দেখিয়েছেন ইলাকে, যে তার স্বামীর মদ খেয়ে ফেরা এবং শেফালির অনুসন্ধিৎসায় বিব্রত হয়। এরপর আসে শান্তিময় এক অধ্যাপক পরিবারের কথা, যেখানে অধ্যাপক হিরণ্ময় তার শালিকে গর্ভবতী করেছে। দ্বারিক নামে আর একটি চরিত্র আসে, যার প্রথম যৌবন গেছে বিবেকানন্দ ও মাও সে তুঙ-এর আদর্শে আর চাকরি জীবনে রবীন্দ্রনাথে। আর আছে খেলা পাগল অসীম। সে স্বপ্ন দেখে ইউসেবিয়ার অর্থ-প্রতিপত্তি পাবার। এই চরিত্রগুলি উপন্যাসে বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। আর এই আবর্তনের মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা, ক্লেদাক্ততা ও স্বার্থপরতা ফুটে ওঠে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "মতি নন্দীর এই ধরনের উপন্যাসে আধুনিক জীবনের ট্র্যাজেডি লুপ্তপ্রায় মানবিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস ক্রিয়াশীল।"[৯]

'দ্বাদশ ব্যক্তি' উপন্যাসে অপরাধবোধ, পাপবোধ, জীবনের উপহাস ও বিদ্রুপের মধ্যে দাঁড়ানো মধ্যবিত্তের কথা উঠে এসেছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তারকের মানসিকতা, সামাজিকতা, রাজনৈতিকতা, নৈতিকতা সব হারিয়ে গেছে। সে সমাজের দ্বাদশ ব্যক্তি, খাটুনি

দিতেই যার ডাক পড়ে। তার কোনো ক্ষমতা নেই দলকে বাঁচাতে। দ্বাদশ ব্যক্তির উপমানটি ছড়িয়ে থাকে উপন্যাসের সর্বত্র। এই উপন্যাসে রাজনীতি উপেক্ষিত থেকেছে। চরিত্রগুলির উদাসীনতায় ও ব্যক্তিগত চাপের কাছে রাজনীতি গুরুত্ব হারায়। কোঅর্ডিনেশন কমিটির অধিবেশন, রাস্তায় গুলি চলা, ট্রাম বাস পোড়ানো, পথে পথে ব্যারিকেড, মানুষের রক্তে রাস্তা লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে। দিব্যেন্দু পালিতের 'আমরা' উপন্যাসেও প্রিয়নাথ বা তার বন্ধুর কাছে রাজনীতি কোনো সাড়া ফেলেনি। ভিয়েতনামকে সামনে রেখে মিটিং, মিছিল, জনসভার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু প্রিয়নাথের বন্ধু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে 'হ্যাঁ মশাই, প্রিয়নাথবাবু, ভিয়েতনাম জায়গাটা কোথায়?' তখন বোঝা যায় স্বাধীনতার এতো বছর পরেও সাধারণ মানুষ রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন নয়। এই দুটি উপন্যাসে ছয়-সাতের দশকের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠিকই কিন্তু রাজনীতি নিয়ে লেখকদের উচ্ছ্বাস ততোটা ধরা পড়েনি। সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থে তারক সিংহকে 'অনুভূতির অসাড়তা' বলেছিলেন।[১০] এই অনুভূতির অসাড়তা প্রিয়নাথের মধ্যেও সমানভাবে চলতে থাকে। প্রিয়নাথও আবেগহীন, বস্তুসর্বস্ব। কোনো কিছুই তার মনকে সহজে স্পর্শ করতে পারে না।

বস্তুত খেলাকে সাহিত্যের উপকরণ করে মতি নন্দী নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। খেলা মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও সুখের জরুরি কারণ হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। 'স্ট্রাইকার' (১৯৭৩), 'ননীদা নট আউট' (১৯৭৩), 'স্টপার' (১৯৭৪), 'একদা ক্রিকেট' (১৯৭৫), 'এম্পিয়ারিং' (১৯৭৬) প্রভৃতি গ্রন্থে মতি নন্দী মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলাকে মিলিয়ে মিশিয়ে অঙ্গীভূত করে সুখ-দুঃখের কারণ রূপে উপস্থিত করেছেন। প্রেম-নারী-প্রকৃতি যেমন সাহিত্যের উপকরণ তেমনি খেলাকেও সাহিত্যের একটি সুখ-দুঃখের অনিবার্য শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে মতি নন্দীর এই সব রচনাগুলিতে। খেলাকে উপলক্ষ করে মনুষ্যত্বের অপমানে খেলোয়াড়ের জীবন যে কি মর্মান্তিকভাবে শেষ হয়ে যায় তার কথাও যেমন মতি নন্দী লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন, সেই অমানুষিক কশাইবৃত্তির মধ্যেও খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিচয় পৌরুষের কথা। দিব্যেন্দু পালিত যেসময় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি লিখেছেন মূলত বিজ্ঞাপন জগৎ নিয়ে মতি নন্দীও সেই সময় ক্রীড়া জগৎ নিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি লিখেছেন। দুই লেখকের বিষয়বস্তু ভিন্ন কিন্তু চরিত্রগুলি কোথায় যেন এক জায়গায় এসে

মিলিত হয়। তাদের জীবন সমস্যা এক। একজন দেখিয়েছেন বিজ্ঞাপন জগতের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনঅভিজ্ঞতা। অন্যজন শুনিয়েছেন খেলার ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনকথা।

এই সময়পর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বহু বিচিত্র ধরনের উপন্যাস লিখেছেন। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর লেখা সম্পর্কে জানান—

> "মাটির নিবিড়তায় ফলে ওঠা গাছ-পালা, জলে জঙ্গলে বিচরণশীল পশুপাখি নিয়ে লিখেছেন। মানুষের গড়ে তোলা ঘরবাড়ি, বিষয় আশয় নিয়ে; কখনো একান্ত শহরের মানুষের অন্য কোনো ব্যবসায়ের নেশা— কারখানা-কোলিয়ারি; কিংবা অর্থসঞ্চয় ও লগ্নির বিভিন্ন খুঁটিনাটি ঘেরা জটিল জাল— এসব নিয়েও উপন্যাস লিখেছেন।...আবার ইতিহাসের বিশাল-জঙ্গম প্রেক্ষাপট, সরাসরি ইতিহাসের বিখ্যাত মানুষ নিয়েও কাজ করেছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।"[১১]

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি হলো— 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'পরস্ত্রী' (১৯৭১), নির্বান্ধব' (১৯৭২), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'হাওয়া গাড়ি' (১৯৭৯, ১৯৮০), 'শাহজাদা দারাশুকো' (১৯৯১) 'এখানে বিরাজি শুয়ে আছে' (১৯৯৪), ইত্যাদি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামজীবন ও শহরজীবন— দুটি জগৎকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রথম দিকের রচনাগুলিতে প্রকৃতি আর মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, গ্রামের মানুষের বিশিষ্ট মানসিকতা, তাদের সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠেছে। যেমন, 'কুবেরের বিষয় আশয়', ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন' ইত্যাদি গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস। 'কুবেরের বিষয় আশয়' এই পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এরপরে নগরজীবন নিয়ে লিখেছেন 'নির্বান্ধব', 'স্বর্গের পাশের বাড়ি', 'অদ্য শেষ রজনী', 'হাওয়া গাড়ি'। মফঃস্বল শহর, পোড়ো বাড়ি, মরা জ্যোৎস্না, বর্ষায় কালো মেঘ এসব ছেড়ে কলকাতার নাগরিক জীবনে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম প্রবেশ করেন 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে। শহর জীবনে অর্থের ক্ষমতার লোভ, মানবিক মূল্যবোধের সীমিত সম্পর্ক— সেই শহর কলকাতায় নিবারণ সব সময় নিজেকে বিশ্লিষ্ঠ মনে করে। সে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, প্রাণের সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় কিন্তু সে জানে কারোর হৃদয়ে তার স্থান নেই। 'স্বর্গের পাশের বাড়ি' উপন্যাসে তিনি শহরের উচ্চাশা বৈচিত্র্য এবং জটিলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'হাওয়া গাড়ি' উপন্যাসে দেখা যায় শহরজীবনের বিচিত্র শ্বাসরোধী ষড়যন্ত্র। এলজন কর্মদক্ষ মানুষকে কাজের কোনো

সুযোগ না দিয়ে হাসিমুখে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়ার মসৃণ ভয়ানক রাজনীতি, তারই মধ্যে দিলীপ কষ্ট পায় তাকে বন্ধু বলে প্রাণের সঙ্গে কেউ গ্রহণ করছে না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে কোনো লেখায় তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি আর পূর্ণতা আমাদের আশ্চর্য করে তোলে। তাঁর নিজের কথাতে জানা যায়, তিনি ইস্পাত কারখানায় কাজ করেছিলেন। জমি-জায়গা সংক্রান্ত কেনা-বেচা, বাড়ি করা, ফসল ফলা, পশুপালন, মাছ ধরা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিত গ্রামজীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর উপন্যাসে কলকাতা শহর ও সেই শহরের মানুষজন মূলত মধ্যবিত্ত মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'চন্দনেশ্বর জংশন'-এর মতো উপন্যাসে অস্তিত্বের মাত্রাবদলের চেহারা ধরা পড়েছে। তাঁর 'এখানে বিরাজি শুয়ে আছে' সামাজিক পারিবারিক ছকে আঁকা একটা জীবননাট্য। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নাট্যকর্মী সৌরভের অভিজ্ঞতার আধারে ধৃত। দিব্যেন্দু পালিতের 'সংঘাত' এবং 'মৌনমুখর' উপন্যাসের কাহিনিও নাট্যকর্মী ঋতুপর্ণা, ব্রততী কিংবা তড়িতের জীবনসংগ্রাম। উপন্যাস দুটিতে নাটক এবং জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঋতুপর্ণা কেবলমাত্র আর্থিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য নাটক করেনি। এক ধরনের আত্মিক মুক্তি নাটকের মধ্যদিয়ে পেতে চেয়েছিল। তা না হলে সে স্কুলের চাকরি দিয়েই পরিবারকে রক্ষা করতো। সংসার আর নাটক— এই দুইয়ের মাঝে পড়ে চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণ দেখিয়েছেন লেখক দিব্যেন্দু পালিত। 'মৌনমুখর' উপন্যাসে সাত-আটের দশকের বাজার অর্থনীতি কীভাবে শিল্পের জগৎকেও গ্রাস করেছিল তার চিত্র আছে। ছোটো ছোটো নাট্যদলগুলি ভেঙে টিভি সিরিয়াল বা সিনেমার দিকে ঝুঁকেছিল। নাটকের দিকে মানুষের ঝোঁকও কমে গিয়েছে। মুনাফালোভীরা ভালো ও দক্ষ নাট্যশিল্পীদের সিনেমার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নাট্যদলগুলি। 'মৌনমুখর' উপন্যাসের ব্রততী একজন দক্ষ নাট্যকর্মী। কিন্তু তার স্বামীর মুনাফালাভের চক্রে পড়ে তার শিল্পীসত্তা বিনষ্ট হয়েছে। অপরদিকে নাটক যার প্রাণ, আবেগ, ভালোবাসার কেন্দ্র, সেই নাট্যশিল্পী তড়িৎ এদের থেকে বাঁচতে পারেনি। উপন্যাসের মধ্যে নাটক ও নাট্যকর্মীদের জীবনকথা এবং বেঁচে থাকা দিব্যেন্দু পালিতই খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সমসময়ের আর একজন ঔপন্যাসিক হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিভ্রান্ত যুবসমাজের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসগুলি হলো— 'আত্মপ্রকাশ', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'জীবন যেরকম', 'অর্জুন' প্রভৃতি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে তিনি হতাশাগ্রস্ত এক উদ্‌ভ্রান্ত তরুণের আত্ম-উন্মোচন করেছেন। বলাবাহুল্য এই উপন্যাসের নায়ক সুনীল লেখকরই স্বীয়-সত্তা। বিশ শতকের সাতের দশকে সাহিত্য ক্রমশই সমাজকে উপেক্ষা করে আত্মসচেতন অন্তর্মুখি হয়ে ওঠে। সেখানে জীবনের সমগ্র রূপ নয়, কেবল ব্যক্তিসত্তার আত্ম-জিজ্ঞাসাই বড়ো হয়ে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রধান হয়ে উঠেছে। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবক কেমন করে নিজের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে চাইছে, স্বপ্ন দেখতে চাইছে— এটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। চারিদিকের অবক্ষয়ের মধ্যেও ব্যক্তিমানুষের চেতনায় জীবনকে ঘিরে বেঁচে থাকার স্বপ্ন জেগে ওঠে। বেকারত্বের, দারিদ্র্যের জ্বালা থাকলেও জীবন এখানে শেষ হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসটির সমসময়ে সমরেশ বসুর 'বিবর', বিমল করের 'যদুবংশ', রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' আর দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম' প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত উপন্যাসে ধংসকারী যুগের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এই যুগের মানুষ একটা অস্থিরতার মধ্যে বাস করেছে। তারা কিছু করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। এই না পারার বেদনায় 'আত্মপ্রকাশ'-এর নায়ক সুনীল পুনরায় শৈশবে ফিরে যেতে চেয়েছে। নতুন করে আবার জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে যেমন 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা অনেক সময় জীবনের নৈরাশ্য বা নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচতে অতীতস্মৃতি চারণা করেছে। শৈশবে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেনি। 'আত্মপ্রকাশে'র নায়ক শেষপর্যন্ত জীবন ও জগতের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে চলতে চেয়েছে। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা নতুন করে বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করতে পারেনি। প্রবল আত্মজিজ্ঞাসায় যখন নিজেদের পাপবোধ, অপরাধবোধ সামনে উঠে এসেছে তখন তারা হয় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, নতুবা নিঃসীম একাকীত্বের জীবন বেঁচে নিয়েছে, কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্ররা বেশি সবল। তারা জীবনে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করেছে। আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক

অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজেছে। সেদিক থেকে দিব্যেন্দু পালিতের নারী চরিত্ররা স্বতন্ত্র।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৬৮) উপন্যাসের নায়ক বেকার ছেলে সিদ্ধার্থ। অর্থনৈতিক তাড়না থাকলেও তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে সহজ সরল একটা সুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষা। নিজের অস্তিত্বকে সে সম্মানের সঙ্গে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাই এই বিপর্যস্ততার যুগে তার এতো লড়াই। অন্যায়ের সঙ্গে সে আপস করেনি। দিনের পর দিন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি না হলেও সে অন্যায় পথে টাকা রোজগারের পথকে ঘৃণা করেছে। দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম'-এর নায়কও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপস করেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার চাকরি খোয়া গেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসে দেশবিভাগের যন্ত্রণা নিয়ে উদ্বাস্তু মানুষের অর্থনৈতিক সংগ্রামের কথা আছে। তবে কেবল দারিদ্র্যজনিত হাহাকারই নয়, উপন্যাসের নায়ক অর্জুনের মানসিক শক্তির স্ফুরণও দেখিয়েছেন লেখক। অর্জুনও কোনোভাবেই অন্যায়কে মেনে নিতে পারেনি। সে সবসময়ই মহাভারতের অর্জুনের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দেশবিভাগের ফলে তার স্বপ্ন হারিয়ে গেলেও সে ভেঙে পড়েনি। সে বেকার হয়েও সজীব, গরীব হয়েও উদার। সে উদ্বাস্তু কলোনিকে নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। মায়ের দুঃখ ভোলাতে চায়। সে শুক্লা নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসে। মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মতোই এই উপন্যাসের অর্জুনকে লেখক প্রতিকূল অবস্থাতেও অবিচল শান্ত সংযত হয়ে জীবনের প্রতি দায়বদ্ধ রেখেছেন। দিব্যেন্দু পালিতও দেশবিভাগ বা বস্তিজীবন নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন 'ভোরের আড়াল' (১৯৯৩)। মধ্যবিত্ত জীবন যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে এসে লেখক দেখান বস্তিবাসীদের জীবন সংগ্রাম। সরস্বতী, জলধর, মৌসুমী, সন্ধ্যা, মৃদুলা, শ্রীধর, গোপাল প্রভৃতি চরিত্ররা বস্তিজীবনের পরিবেশে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট পরিবেশ থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে দিব্যেন্দু পালিতের পার্থক্য হলো পৌরাণিক মিথকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন। মহাভারতের অর্জুনের 'ইমেজ'কে সামনে রেখে 'অর্জুন' উপন্যাসের নায়ককে গড়ে তুলেছেন। আর দিব্যেন্দু পালিত তা করেননি। তিনি কলকাতার বস্তিজীবনের নিম্নবিত্ত মানুষদের নিজেদের শক্তি সামর্থানুযায়ী অঙ্কন করেছেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সমকালের লেখক দেবেশ রায়, মতি নন্দী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা কলকাতাকেন্দ্রিকতার লেখক। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্ররা দিশাহীন হয়ে পড়ে। চরিত্রদের মধ্যে প্রেমের প্রেরণাময় দীপ্তি অপেক্ষায় দাহ ও দীর্ণতা বড়ো হয়ে ওঠে। অস্তিত্বের সংকট আসে ব্যাপকভাবে। যদিও চরিত্রগুলির এই অস্তিত্বের সংকট যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের ফল তা কিন্তু নয়। আলব্যের কাম্যু ও সার্ত্র চর্চার আধিক্য ও অস্তিত্ব অনুদানের প্রশ্নেও এসময় গুরুত্বপূর্ণ হয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'অস্তিত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি মূলীভূত প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছে মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের উপন্যাসে'।[১২]

দিব্যেন্দু পালিতের সময়কার একজন শক্তিশালী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি সেই সকল কথাকারদের অন্যতম, প্রশ্ন যাঁদের উদ্যত অস্তিবোধের দিকে। সেই অস্তিবোধ কখনো সামাজিক সংকটের ঘূর্ণাবর্তের পাক খায় আবার কখনো জিজ্ঞাসায় কাতর হয়। 'ঘুণপোকা' (১৯৬৭), 'পারাপার' (১৯৭১), 'শ্যাওলা' (১৯৭৭), 'মানবজমিন' (১৯৮৮) ইত্যাদি উপন্যাসে তিনি আধুনিক মানুষের জীবন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রকরণ ও কাঠামো সৃষ্টিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। জটিল মানবমনের চোরাবালিতে আলো ফেলেছেন নিজস্ব রীতিতে। তাঁর চরিত্রগুলির আগ্রহ আছে জীবনে, অস্তিত্বের চরিতার্থতার সন্ধানে, অন্তরের গভীর নিঃসঙ্গ অভিযাত্রায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' এবং দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম' 'সন্ধিক্ষণ' কিংবা 'আমরা' উপন্যাসগুলি কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হয়। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। রাজনীতির জগতে কংগ্রেসের স্বপ্ন হঠাৎ এক নতুন বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষে হোঁচট খেয়েছে। স্বপ্নোত্থিত রাষ্ট্রনায়কদের আশাভঙ্গের প্রথম আর্তনাদ সেদিনের যুবমানসে নানা প্রশ্ন জাগিয়েছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' কিংবা দিব্যেন্দু পালিতের 'ভেবেছিলাম', 'সন্ধিক্ষণ', 'আমরা' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় কণ্টকিত নয়। যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তার চেয়েও দ্বন্দ্ব-কাতর এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নই ভাবিত করেছে দুই ঔপন্যাসিককে। 'ঘুণপোকা' উপন্যাসের নায়ক শ্যামের জন্ম স্বাধীনতার আগে লেখকের প্রায় সমসময়ে। আবার 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসের নামহীন যুবক কিংবা 'আমরা' উপন্যাসের প্রিয়নাথেরও জন্ম স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে। তারাও লেখকের সমবয়সী প্রায় ত্রিশ বছরের যুবক। দুটি উপন্যাসেই লেখক সমানভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।

'ঘুণপোকা'র শ্যাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই শুধু স্বাধীনতা বলে ভাবতে পারে, অথচ নতুন ভাবনার পথে ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাকে স্পর্শ করেনি। স্বয়ং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও রাজনীতি-সচেতন অথচ রাজনীতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু 'ঘুণপোকা'য় নয়, সাধারণভাবেই তাঁর নায়কেরা কোনোভাবে বিযুক্ত বা একক হয়ে পড়ে। 'ঘুণপোকা' এর তিন বছর আগে 'ভেবেছিলাম' (১৯৬৪) এবং ছয় বছর পর 'আমরা' (১৯৭৩) উপন্যাস দুটি লিখিত। সময়ের ব্যবধানে শুধু 'আমরা' উপন্যাসটিতে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। তাতেও রাজনীতির বর্ণনা নেই। রাজনীতি সচেতন লেখক দিব্যেন্দু পালিত রাজনীতিকে ব্যবহার করেননি। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিরিশ বছরের যুবকের চাকরি খোয়ানো দিয়ে 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। অপরদিকে 'ঘুণপোকা' উপন্যাসটি শুরু হয় শ্যামের চাকরি খোয়ানো দিয়ে। চাকরি, প্রেম ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত যুবকের আশা ও আশাভঙ্গের কাহিনি 'ভেবেছিলাম'। লেখক এই সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। উপন্যাসের কথকও গম্ভীর ভাব নিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে অজস্র মানুষের মুখ দেখেছেন। দেখেছেন জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া আত্মহত্যা প্রবণ মানুষদের। প্রকৃত মৃত্যুর আগেই যে মানুষের মৃত্যু ঘটে যায় তা সে পলকে পলকে অনুভব করেছে। বন্ধু নিকুঞ্জর মধ্যে দেখেছে শূন্যতার এক গভীর নৈরাশ্য। দিব্যেন্দু পালিত আত্মবিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে যুবকটির বোধ ও অস্তিত্ব হারানো গল্প আমাদের শোনান। শ্যামও তার চারদিকে ছায়ার মতো হেঁটে যাওয়া 'অলীক লোকজন' দেখে নিজেকে হারায়, মানুষগুলিকে দেখে তার মনে হয় মায়াবী হরিণ। কিন্তু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দুজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার ফাঁকি, অন্তঃসারশূন্যতা শ্যাম ও নামহীন যুবককে বারবার তাড়না করেছে ঠিকই কিন্তু দিব্যেন্দু পালিতের নায়ক বোধ ও অস্তিত্ব হারিয়ে শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যায়। আর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নায়ক নিজের জানার তাড়নায় আবারও অস্থির হয়ে উঠেছে, ভবঘুরে হয়ে ঘুরেছে, খুঁজেছে জীবনের অর্থ।

'ঘুণপোকা' উপন্যাসের চরিত্ররা স্বীকারোক্তি ও আত্মময়তার মধ্যদিয়ে আত্ম-আবিষ্কার করতে পেরেছে। তা আরো স্পষ্টতর হয়েছে 'পারাপার' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে রাজনীতির ব্যাপ্তি আছে। একদা কলেজের কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা ললিত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত।

'ঘুণপোকার মতো এককেন্দ্রিকতা এই উপন্যাসে নেই। ললিত, রমেন, বিমান, তুলসী, আদিত্য— সবাই আত্মসন্ধানে বেরিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই অন্তর্মুখি। ছোটো ছোটো ঘটনা বলয়ে একে অপরকে স্পর্শ করলেও তারা সবাই একা, নিঃসঙ্গ। সমাজে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসই তাদের জীবনের প্রথম ও শেষ কথা। শ্যাম বড়ো মায়ায়, বড়ো ভালোবাসায় পৃথিবীর ধুলোমাটিকে আঁকড়ে ধরেছিল। আর 'পারাপারে'র রোগাক্রান্ত ললিতের ইচ্ছে করে আর একবার শিশু হয়ে এই ধরিত্রী মায়ের কোলে ফিরে আসতে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে এরকম ভাবনা নেই। তাঁর উপন্যাসে চরিত্ররা মৃত্যুকে ভয় পায় না। জীবনের পাপ-পঙ্কিলতা, অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করার চিন্তা করে তারা। আসলে দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা অনেক বেশি প্রকৃতি বিরোধী। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নিজেরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বেশি ধরা পড়েছে। প্রথম জীবনে দু-একটি উপন্যাসে অল্পবয়সী যুবক-যুবতীর প্রেম ও প্রেমহীনতা, আশা ও আশাভঙ্গতা, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা গেলেও ১৯৭১ সালের পর দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে সেই ধারার পরিবর্তন ঘটে। দিব্যেন্দু পালিতের লেখালিখির স্বতন্ত্র জগৎ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে শুরু হয়। তাই হয়তো সমকালীন লেখকদের দু-একটি রচনার চরিত্রের সঙ্গে তার উপন্যাসের চরিত্রের মিল ঘটে যায়।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলি আকারে ছোটো। তাতে কাহিনি নেই বললেই চলে। একটি ব্যতীত দুটি কাহিনি নেই। চরিত্রের মনোজগতকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্রের সংখ্যাও কম। নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা প্রধান হয়ে উঠে তাঁর উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সম্পর্কের ভাঙন অনিবার্য রূপ নেয়। তারপর তাদের সন্তান-সন্ততির মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি আকারে বড়ো। কেবল আয়তনে বিশাল নয়, ব্যপ্তিতেও বিশাল। 'মানবজমিন', 'দূরবীন' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি গভীরতায় ও ব্যঞ্জনায় পাঠকের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। বহু চিন্তার অভিজ্ঞতা, প্রখর মনন ও এক ধরনের দার্শনিকতা উপন্যাসগুলিকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় নিপুণভাবে চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন এবং তাদের মধ্যে মানবিক অনুভূতির বিচিত্রলীলা দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা জটিল এবং বিশাল বিশ্বের নানান প্রশ্নের মায়াবী বিষণ্ণতায়

আচ্ছন্ন। শ্যাম, সোমেন, ললিত, কুকু, ধ্রুব, সজল, কৃষ্ণজীবনরা বিচিত্র জটিলতার মধ্যে কেমন যেন বিষণ্ণতায় মন্থর। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় হয়ে ওঠেন অন্তত এই কারণে যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা অস্তিত্বের শিকড় খুঁজেছে সত্য সন্ধানের ব্যাকুলতা নিয়ে। এছাড়া কখনো কখনো মমতা মাখানো 'নস্টালজিয়া', কখনো দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ বর্তমানকে নানাদিক থেকে লক্ষ করতে করতে বিপুল এক কম্পমান জিজ্ঞাসাকে অনন্তে মেলে ধরে। তারা সত্তাকে একবিন্দুতে কেন্দ্রিভূত করেছে। আর দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা সম্পর্কের বেড়াজাল ভেঙে বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তানের সঙ্গে বাবা-মার সম্পর্ক, বন্ধুত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সব ভেঙে গেছে ব্যক্তিসত্তার খোঁজে। সময়ের চাপেই হোক আর সম্পর্কের ভালো না লাগার চাপেই হোক চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দিব্যেন্দু পালিত এক একটি চরিত্রকে অন্তরের গভীরে নিয়ে গিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসে কাহিনি বড়ো হয়ে ওঠেনি। উপকাহিনি যেমন নেই, তেমনি চরিত্রের সংখ্যাও কম। এই সব দিক থেকে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর সমকালীন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের থেকে স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সামাজিক জীবনে নানা পালা-বদল ঘটেছে। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, উপার্জনশীল নারীসমাজের আবির্ভাব, ফ্ল্যাটবাড়িকেন্দ্রিক ছোটো পরিবারের অভ্যুদয়, হিন্দুকোড আইন পাশের পর পৈতৃক সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন সম্মত সুযোগ লাভের ফলে সমাজের চেহারা খুব দ্রুত বদলে যেতে থাকে। সাহিত্যেও এর প্রকাশ ঘটেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' উপন্যাসে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন এবং 'মহানগর' ও 'দূর ভাষিণী' উপন্যাসে ওয়ার্কিং গার্ল-এর ছবি দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি শাসন ও সংস্কার বন্ধনের অবসানের চিত্র ধরা পড়েছে। বিবাহবিচ্ছেদ-অধিকারের প্রয়োগ এবং দাম্পত্যনিষ্ঠার অবসান দেখা যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদমফুল' ও 'বন্যাকন্যা' উপন্যাসদুটিতে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'দম্পতি' উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে দাম্পত্যজীবনে বিপর্যয়ের ছবি ফুটে ওঠে। মানবিক মূল্যবোধের অবসান ও ব্যক্তিচরিত্রের বিনষ্টির চিত্র বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ও 'একক দশক শতক' উপন্যাসে দেখা যায়। সামাজিক পালাবদলের নানা ছবি ফুটে ওঠে বিমল করের 'কালের নায়ক' উপন্যাসে। আশির দশকের কলকাতার নিম্নবিত্ত

একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের ভাঙনের কাহিনি এতে ধরা পড়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজ আশাহীন হয়ে পড়েছে। একই পরিবারে থেকে রথীন পৃথক বাড়ি তৈরীর জন্য অর্থসঞ্চয় করে, একান্নবর্তী সংসারে টাকা দিতে চায় না। পরিবারের সবার মধ্যে এক ধরনের সম্প্রীতির আলগা বন্ধন দেখা দেয়। রথীন, মহীন, সতীন আর তাদের অবিবাহিত বোন কাজল ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত রথীন আর সতীন হাতাহাতি-মারপিঠ করে। আহত সতীনকে দেখে কাজলের মনে হয় যেন দ্বিতীয়বার বাবাকে পুড়িয়ে এসে নুয়ে পড়ে দাদা কাঁদছে। সার্বিক ভাঙনের এই বাস্তব চিত্র আজো নির্মমভাবে প্রতিফলিত।

সুনীল গঙ্গোপাধায়ের 'জীবন যে রকম' (১৯৭৯) উপন্যাসে নাগরিকতার একটি বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। পুরনো মূল্যবোধের অবসান, পারিবারিক নৈতিক শাসন, সেন্টিমেন্টের পরাজয়, ব্যক্তিচরিত্রের ঔদ্ধত্য ও অহংবোধের প্রতিষ্ঠা— এই সব লক্ষণ এখানে ধরা পড়েছে। চাইবাসা হলুদ পুখরি থেকে সকাল সাড়ে ন'টায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছায় দীপু। প্রকৃতির শান্ত ও নিভৃতি থেকে চলে এসে উপনীত হয় দ্রুতগতি ঊর্ধ্বশ্বাস কলরবমুখরিত নাগরিক জীবনে— এখানে সবাই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত। বেকার সমস্যা, বন্ধুজীবনের সমস্যা, কলেজজীবনের সমস্যা, পাড়ার মস্তানদের নিয়ে সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সমস্যা ইত্যাদি নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত দীপু। এই সব সমস্যা এসেছে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ নিয়ে। অপরদিকে দিব্যেন্দু পালিতের 'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসে ঠিক এর বিপরীত চিত্র ধরা পড়েছে। অশোক এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। "আট বছর আগে একদিন যখন হাওড়া স্টেশন থেকে লুপ লাইনের ট্রেনে চড়ে রওনা হয়েছিল এই অজ শহরের দিকে চাকরি করতে, তখন মনে হয়েছিল জীবন এরপর অর্থহিন হয়ে পড়বে। ভাগ্যকে দোষ দিয়েছিল সে। অব্যক্ত অভিমানে ইচ্ছে হয়েছিল আত্মহত্যা করতে। এখনো তার মন পড়ে রয়েছে কলকাতার দিকে।"[১৩]

দিব্যেন্দু পালিতের চরিত্ররা কলকাতা শহরের বাইরে বেরতে চায়নি। কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনযাত্রা প্রসারিত। শহরের বাইরে যখনই গেছে তখন তাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শহর কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশোক নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যিই কি একা তুমি? সত্যি ক্লান্ত?' অশোক সত্যিই একা। সে পরিবারহীন, আত্মীয়-স্বজনহীন। শহর কলকাতা থেকে গ্রাম বাংলায় আসে চাকরি নিয়ে। এখানে

হরবিলাসবাবুর বাড়িতে সাতদিনের ভাড়া থেকে পরিবারের সবার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে হয়ে পড়ে। হরবিলাসবাবু মারা গেলে তার স্ত্রী তিন মেয়েকে নিয়ে বিপাকে পড়ে। একমাত্র খেপাটে ছেলে কলকাতায় পালিয়ে যায়। একটি মেয়েরও বিয়ে দিতে না পারায় অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শুনতে হয় রাজবালাকে। তার বড়ো মেয়ে গায়ত্রীকে নিয়ে অপবাদ, মেজো মেয়ে শিখা এক মুসলিম যুবকের পাণিপ্রার্থী হয়ে একসময় পালিয়ে বিয়ে করে। গ্রাম বাংলার নির্মল প্রকৃতির পরিবর্তে অশোকের চোখে ধরা পড়ে মানুষের কদর্যতার বিভিন্ন দিক। বাণী ও কল্যাণের একমাত্র শিশুকন্যা তাদেরই চাকরের হাতে ধর্ষিতা ও খুন হয়। হরেন ঘোষের গুণ্ডাদের হাতে কলেজের প্রিন্সিপাল বিনয়বাবু আক্রান্ত হয়, মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে হরেন ঘোষ তার পালিত গুণ্ডাদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনে। একরকম পাপ-ক্রোধ, হিংসা-মারামারি, আদর্শহীনতা, দুর্নীতি ইত্যাদি সবকিছুতে কলঙ্কিত হয়েছে গ্রাম বাংলার পরিবেশ। এইরকম পরিস্থিতিতে বাণী আর কল্যাণ চাকরি থেকে রিজাইন দিয়ে কলকাতামুখি হয়। গ্রামবাংলার সমাজজীবন এভাবে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই একটি মাত্র উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত গ্রামবাংলার পটভূমিকে তুলে ধরেছেন। তবে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে সামাজিক-পারিবারিক সমস্যাগুলি খুব বড়ো পটভূমিতে অঙ্কিত নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের এক একটা দিক এক একটা উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা যেখানে মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ভাঙনের ছবি অঙ্কন করেছেন, দিব্যেন্দু পালিত তা করেননি। তাঁর উপন্যাসে ভাঙনের পর পরিবারে বা মানুষের জীবনে কি প্রভাব পড়েছে তা বড়ো হয়ে উঠেছে। যেমন 'প্রণয়চিহ্ন' উপন্যাসে একান্নবর্তী পরিবারে নমিতার বিয়ে হওয়ায় সে তার স্বামীকে নিবিড়ভাবে পায়নি। তাই স্বামী যখন ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত নেয় তখন নমিতা খুশি হয়। নমিতা একান্নবর্তী পরিবারের আবেষ্টনী ছেড়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহে স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়। নমিতা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বিবাহবিচ্ছিন্না নমিতাকে কেউ ঘর ভাড়াও দিতে চায়নি। লেখক এখানে দেখান স্বামী পরিত্যক্তা একজন নারীর একা সমাজে বসবাস করলে কি কি অসুবিধায় পড়তে হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে পালাবদল ঘটে আটের দশক থেকে। এই সময় পর্বে দিব্যেন্দু পালিত দেশ-কাল প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"একজন লেখক হিসাবে ঐ সময়ের (নকশাল আন্দোলন ১৯৬৭-১৯৭১ সাল) রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে আমি অংশগ্রহণ না করলেও এর পরোক্ষ চাপ এড়াতে পারিনি। যখন 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি লিখেছি তখন আমার বয়স চল্লিশ-একচল্লিশ হবে। কিন্তু যখনকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছি তখন আমার বয়স প্রায় আরও দশ বছর কম। নকশাল আন্দোলনে যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার সমবয়সী বা আমার চেয়ে বয়সে বড় এবং আরও অনেকেই ছিলেন আমার চেয়ে বয়সে ছোট। অর্থাৎ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমার পরিচিতদের মধ্যে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী সেইসময় রাজনীতিতে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে এবং তাঁদের কেউ কেউ পুলিশের গুলিতে মারা যায় বা বন্দী অবস্থায় অত্যাচারিত হয়ে কোনও না কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে এই আন্দোলন-বিরোধিতার রাষ্ট্রিক দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাউকে কাউকেও আমি চিনতাম। সবমিলিয়ে যখন অবস্থাটা এমনই ছিল যা যে-কোনও বিবেকবান মানুষের আত্মিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কোন্ পক্ষ দোষী, কোন্ পক্ষ নির্দোষ তা বিচার করার সময় ছিল না, ঘটনা ঘটেই চলেছিল এবং দুপক্ষের মনোভাবেই এসে গিয়েছিল অন্ধকার। কিন্তু একান্তে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে গিয়ে কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে দেশের সঠিক অবস্থা এখন এমনই যে একটা প্রতিবাদ ও পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। নকশাল আন্দোলন ঠিক পথে চালিত হয়েছিল না ভুল পথে চালিত হয়েছিল সে প্রশ্ন গৌণ, কিন্তু পথ যেমনই নেওয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্য বা আদর্শ কিন্তু অন্যরকম ছিল। তা হল আন্দোলন দমনের নামে একটি রাষ্ট্রিক গণহত্যার প্রবণতা, যার অন্যদিকে ছিল নকশালদের একাংশের বেপরোয়া সংগ্রাম।"[১৪]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তৃতীয় ভুবন' উপন্যাসে দুজন সমমতাদর্শী যুবকযুবতীর অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটন করেন, তখন মতাদর্শের সংকট সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 'বিবাহবার্ষিকী' উপন্যাসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিখণ্ডীভবনের প্রতিফলন ঘটেছে সহকর্মীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে। চীনা আক্রমনের পর যখন ১৯৬৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে ভাগ হয়ে যায় তখনো মতাদর্শের সংঘাত থেকে কোনো বড়ো লেখা বের হয়নি। অথচ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কালেই পাওয়া যায় ননী ভৌমিকের 'ধুলো মাটি'র মতো

জোরালো উপন্যাস। নায়ক চরিত্রের সংগ্রাম ও আত্মসচেতনার বিকাশ ঘটলেও আরো অনেকের মতোই তিনিও অন্যতর বিবেচনায় নীরব থাকেন। সাতের দশকের পর যে বিষয়টি বাংলা সাহিত্যকে সবথেকে বেশি পুষ্টি প্রদান করেছিল তা হলো নকশাল আন্দোলন। এটি আমাদের অস্তিত্বের মূলে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এই সময় রাজনৈতিক উপন্যাস নতুনভাবে লেখা শুরু হয়। সমরেশ বসুর 'যুগ যুগ জিয়ে' উপন্যাসে পলিটিক্যাল পার্টিকে গ্রুপ হিসেবে দেখার একটা মনোভাব লক্ষ করা যায়। গ্রুপের প্রেসার যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ও স্বাধীনতা গ্রাস করতে চায় ত্রিবিদেশের মধ্যদিয়ে সে কথা বলতে চেয়েছেন। 'মহাকালের রথের ঘোড়া'য় রুইতন কুর্মির রাজনৈতিক দুরাশার বাস্তব পৃষ্ঠপট অবহেলিত থেকে গেছে। এই উপন্যাসে সামাজিক টেনশন আর ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া— একসঙ্গে দেখতে হয়।

নকশাল আন্দোলন নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ব্যক্তির বিষণ্ণ পরাভবের কথা বলতে চেয়েছেন। এই সময়ের চরিত্রদের বাহ্যিক দিকটা লেখকরা খুব একটা ভিতর থেকে দেখেননি। চরিত্রদের পরিস্থিতিই তাদের ভাবিয়েছে। যেমন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'শ্যাওলা' উপন্যাসের হিরণ্ময়। এই সময়ের রাজনৈতিক অস্তিত্ব অনেক বেশি চঞ্চল ও যন্ত্রণাময়। ভিতর থেকে যাঁরা বিষয়টাকে বুঝলেন তাঁদের মধ্যে দুজন ঔপন্যাসিক হলেন দেবেশ রায় এবং অসীম রায়। দেবেশ রায় 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' উপন্যাসে রক্তাক্ত পটভূমি ও মনোভূমিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। অসীম রায় 'আবহমান কাল' উপন্যাসে রাজনৈতিক রূপান্তর ও ব্যক্তির রূপান্তরের ছন্দকে তুলে ধরেছেন। এর বিপরীতে আবার সমরেশ মজুমদার 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে দেখান আমাদের স্বপ্নভঙ্গের যুগে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের গোড়ার দিকের কথা, যেখানে স্বপ্ন আর স্বপ্নদ্রষ্টা দুইয়ের মধ্যে কতো অসঙ্গতি ছিল। অসীম রায়ের 'একদা ট্রেনে', 'শব্দের খাঁচায়' ইত্যাদিতে ব্যক্তি চেতনার সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে রাজনীতির কথা উঠে আসে। 'আবহমান কাল'-এর নায়ক টুটুলের সমগ্র হয়ে ওঠায় তার রাজনৈতিক গঠন-ভাঙন গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

যাঁরা নকশাল আন্দোলনকে অত্যন্ত একটা জটিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁরা হলেন— স্বর্ণ মিত্র এবং শৈবাল মিত্র। স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' উপন্যাসের রঘুর ভিতর দিয়ে দেখা যায় সেদিনের যুবক-সংকল্পের চেহারা। চরিত্রটি রাজনৈতিক মতাদর্শ-সমভূত এমন একটা চরিত্র যা একটা সময়ের বাঙালি যুবমানসের সৎ,

সংকল্পের প্রতিনিধি। 'অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসেও শৈবাল মিত্র সেই দুর্দমনীয় যুবকদের বীরত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। এঁদের থেকে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' এবং 'অপারেশন বসাই টুডু' অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বসাইটুডু স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অগ্নিস্তম্ভ চরিত্র। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী কথাসাহিত্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শিল্পসার্থক রাজনৈতিক ব্যক্তিচরিত্র। তবে বাঙালি লেখকরা নকশাল আন্দোলনের আগুনঝরা দিনগুলিতে একটা কথা বুঝেছিলেন যে, এ আগুন, এ রক্ত আমাদের সকলের। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্রোতের মুখে' বা 'গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বন্ধুমেধ' কিংবা তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' প্রমাণ করে বাঙালির উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগকে।

এই সময়ের সন্ধিক্ষণের মধ্যে আধুনিক মানুষের বন্দীত্ব, ব্যক্তিসত্তার বন্দীত্ব, নিঃসঙ্গতাবোধ এগুলির প্রকাশ পায়নি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন—

> "এতকাল ধরে সাহিত্যিকরা যে নিঃসঙ্গতার মধ্যদিয়ে সাহিত্য রচনা করে এসেছেন সেই নিঃসঙ্গতার রূপ তাদের চোখে ধরা পড়েও পড়েনি, কারণ এই নিঃসঙ্গতা আধুনিক সময়েরই একটা নতুন ধরনের প্রতিক্রিয়া। সেই প্রতিক্রিয়াটা খুব সুন্দরভাবে এবং গুছিয়ে, ভাষাকে অত্যন্ত শাণিত ও মার্জিত করে এবং অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিব্যেন্দু লিখতে পেরেছে। এইভাবে কিন্তু কেউ লিখতে পারেনি।"[১৫]

দিব্যেন্দু পালিত আধুনিক নাগরিক সমাজের কথাকার। মনে নাগরিকতাকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর সত্তা যেন একটা জায়গায় কেন্দ্রিভূত হয়েছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, চেতনা সমস্ত কিছুই এই নাগরিকতার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেছে। তাঁর লেখার মধ্যে কলকাতা শহরের মানুষ আর সেই মানুষের সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে যাওয়ার ছবি দেখা যায়। অনেক লেখকই এই সময় কলকাতা শহরের মানুষ ও তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিত যেভাবে লেখেন সেভাবে অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ধরা পড়েনি। যেমন, 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের শুরুতে একটা মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে। এই মৃত্যুটিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রদের মানসিক টানাপোড়েন দেখান তিনি। কনকের বন্ধুবান্ধব, তার বাবা-মা, দুই বোন, এবং প্রাক্তন প্রেমিকা যার সঙ্গে এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছিল— তাদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কের জটিলতা, ধ্বসে যাওয়া, কখনো কখনো কিছু

প্রত্যাশার জন্ম এই সব নিয়ে তাদের অন্তর্জগৎটিকে দিব্যেন্দু পালিত অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দিব্যেন্দু পালিতের সমবয়সী যাঁরা তাঁদের কিন্তু এইভাবে চরিত্রের অন্তর্জগতে বসে থাকা বা অন্তর্জগতে চলে আসা লক্ষ করা যায় না। দিব্যেন্দু পালিত চরিত্রগুলিকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। দেখেছেন তাদের অন্তর-বাহির, মনের অলিগলি, অন্দরমহল। আর সর্বোপরি চরিত্রগুলির সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু অভিজ্ঞতা তাঁকে এই বোধ ও চেতনা দিয়েছে। যেমন বিজ্ঞাপন জগৎ নিয়ে লেখা তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ঢেউ' প্রকাশমাত্রই সাড়া জাগিয়ে ছিল পাঠক মহলে। কেননা এই জগতের অন্দরমহলটা তিনি নিবিড়ভাবে চিনেছেন তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে।

'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসটি সাতের দশকের প্রত্যক্ষ অগ্নিগর্ভে লিখিত নয়। দিব্যেন্দু পালিত এই সময় মাঝে মাঝে যে সমস্ত বিষয়কে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সেখানে বিজ্ঞাপন জগৎ বা সংবাদ জগৎ নিজে আলোড়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। সংবাদ নিজে নিজে সাহিত্য নয়। সংবাদের রহস্য হয়তো অনেকদিন ধরে পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে। কিছুদিন পর তা আর সংবাদপাঠকের মনে থাকে না। কিন্তু দিব্যেন্দু পালিত সেই সংবাদকে সংবাদপত্রিকা থেকে সরিয়ে আনেন। রিপোর্টার্স ডেস্ক থেকে সেই সংবাদ ঠাঁই পায় তাঁর লেখার টেবিলে। তারপর তা সাহিত্যের এলাকায়। 'অনুভব', 'অন্তর্ধান', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি এই বিষয়ে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সময়েই আর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন 'স্বপ্নের ভিতর'। এটি কিন্তু সে-জাতীয় রচনা নয়। এতে সময়ের কোনো অভিঘাতও হানা দেয়নি। সমালোচক সরোজ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সময়ের প্রবর্তিত জীবনের নতুন ছাঁদ, নতুন প্রেক্ষাপট ও পটবিধৃত চরিত্র ও তাদের সংকট এ উপন্যাসে প্রধান কথা। দুটি কর্মরত জীবন জীবিকার সূত্রে নিবদ্ধ দুটি নারীর উচ্চাবচ অস্তিত্বের আবর্ত এখানে প্রধান কথা। সন্দেহ নেই এও এক বিপন্ন সীমান্তের কথা।"[১৬]

'সহযোদ্ধা' আর এক ধরনের উপন্যাস। যেখানে অস্থির সময়ের বিপন্নতার মধ্যেও মানুষ বিবেকবান হয়ে ওঠে। 'অনুভবে' চরিত্রচিত্রণ এবং উপলব্ধির শীর্ষতায় পৌঁছেছিলেন। বিষয়বৈচিত্র্যের অসাধারণত্বও নজর কেড়েছিল পাঠকদের। এমনকি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস

‘একদিন সারাদিন’ও এক অদ্ভুত অনুভূতির মুখোমুখি দাঁড় করায় পাঠককে। বিবাহবিচ্ছিন্না নারীরা সমাজে একা বসবাস করলে কি কি ঘটতে পারে তার রূপরেখা দেখিয়েছেন তিনি। চেনা সমস্যাকেই কি অসাধারণ দক্ষতায় এঁকেছেন এই উপন্যাসে। প্রায় তিরিশ বছরের কাছাকাছি যুবতী শর্মিলার সঙ্গে অজয়ের ভুল বোঝাবুঝি, বিবাহবিচ্ছেদ, অজয়ের ভাই সুজয়ের সঙ্গে তার এক চিলতে সম্পর্ক এবং অচিনের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সবকিছুই পরিবেশিত হয়েছে এক শিল্পিত সুষমায়।

দিব্যেন্দু পালিত এমন এক তীক্ষ্ণ সংবেদনে নারীমনস্তত্ত্বকে আমাদের গোচরে আনেন কিংবা এমন একটা আন্তর্জাতিক বীক্ষা উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন যা এই বিশ্বায়নের সময়েও অনেক জনপ্রিয় লেখকদের রচনায় সচরাচর দেখা যায় না। তিনি সহানুভূতিপূর্ণ মন দিয়ে নারীর ভিতরের সমস্যাগুলিকে দেখিয়েছেন।

চরিত্রের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবনদর্শন। ‘উড়োচিঠি’ উপন্যাসে অনীশ বলেছিল, ‘লাইফ আসলে একটা উড়োচিঠির ব্যাপার। একদিন না একদিন সকলেই পায়। কেউ সুখের খবর, কেউ দুঃখের। যে যেমন পায় সেভাবেই চলে’। একথার সত্যতা ধরা পড়েছে দিব্যেন্দু পালিতের বেশিরভাগ চরিত্রের ক্ষেত্রে। তিনি অস্তিস্ত্বের চেনা জগৎটাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ব্যাপক চেনা বৃত্তের মধ্যে যে ছোটো ছোটো অচেনা অংশ আছে— সেই মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অচেনা অথচ সম্ভাব্য অন্তঃস্রোতগুলি তাঁর লেখায় এমনভাবে ধরা পড়েছে যা পাঠকের চেনা আরো তীব্র ও গভীরতর হয়। নিজেদের শ্রেণি ও জীবনকে এবং শেষপর্যন্ত হয়তো মানুষকে, আরো একটু বেশি করে বুঝতে শুরু করে পাঠকেরা। অথচ বুদ্ধিদীপ্ত পরিমিতিবোধে সেগুলি নিখুঁত নির্মাণ। আপাততুচ্ছ অভিজ্ঞতায় ভিন্নতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এখানেই দিব্যেন্দু পালিত স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), কলকাতা, বিশ্বভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, পৃ. ৫১১

২. কর, বিমল : দেওয়াল (অখণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পৃ. ৫৫১

৩. পুরকাইত, উত্তম (সম্পাদিত) : শশাঙ্কশেখর, হিরণ্ময় এবং রমাপদ চৌধুরী, সাক্ষাৎকার-দীপঙ্কার দাস, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্ষ-২, অক্টোবর ১৯৮৯, উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২০, পৃ. ৩৮

৪. চৌধুরী, রমাপদ : খারিজ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, হুগলী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৯

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৪১

৬. তদেব : পৃ. ৩৪৮

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৮২

৮. নন্দী, মতি : নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১১৫

৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর

বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৩৪৫

১০. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ : বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯ পৃ. ১৮২

১১. দে, অমর (সম্পাদিত) : লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আর ভালোবাসা, সুমিতা চক্রবর্তী, গল্পসরণি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা : দুই, দ্বাবিংশতি বর্ষ, ২০১৮, পৃ. ৭২

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৭

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : দশটি উপন্যাস-১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৯০

১৪. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০, পৃ. ৭২

১৫. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : চ্যালেঞ্জ নিতে সমর্থ হয়েছে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১১

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৩৫০

উপসংহার

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে শেষ উপন্যাস 'একদিন সারাদিন' (২০০৩) — এই কালপর্বে গভীর ও পরিব্যাপ্ত এক আধুনিক নগর চেতনাকে সংহত ভাবে বিম্বিত করেন। এই সময়ের মধ্যে ঔপন্যাসিক রূপেই কেবল বাঙালি নয়, সর্বভারতীয় পাঠক গোষ্ঠীর কাছে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর উপন্যাস কোনো না কোনো দিক থেকে জীবন সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধিতে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। সমকালীন লেখকদের তুলনায় কমই লিখেছেন তিনি। কিন্তু যা লিখেছেন, মননশীল পাঠকের কাছে তা মূল্যবান হয়ে উঠেছে। তিনি সুখপাঠ্য উপন্যাস লিখতে চাননি। ভুরি ভুরি লিখতে গিয়ে বিস্তর অপাঠ্যও লেখেননি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হয়েই পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছেন। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা-মায়া-স্নেহ-মমত্ববোধ এক স্নিগ্ধ আলোর মতো ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলোকে। তাঁর 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস', 'অচেনা আবেগ' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের স্নিগ্ধতা, 'সোনালী জীবন' উপন্যাসের দেশান্তরী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবার, 'সহযোদ্ধা' উপন্যাসে ভোররাতে খুন হতে দেখে ফেলা আদিত্যর মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, 'উড়োচিঠি'র বাউন্ডুলে রজতকে নিয়ে টুপুরের মনের দোলাচলতা, 'বিনিদ্র'তে দীপ্তর চড়াই-উৎরাই, 'স্বপ্নের ভিতর'-এ অর্পিতা ও বিশাখার অতীত স্মৃতি চারণা, 'অনুভব'-এ আত্রেয়ীর আত্মবিশ্লেষণ— এসবই সময়ের প্রেক্ষাপটে নিপুণ বাস্তবগ্রাহ্য ভঙ্গিতে তুলে ধরেছিলেন তিনি। এছাড়াও সংবাদপত্রের ঘটনা স্থান পেয়েছে 'অন্তর্ধান', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়' প্রভৃতি উপন্যাসে। বিজ্ঞাপন ও বিপণন সংক্রান্ত বিষয় স্থান পেয়েছে 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' প্রভৃতি উপন্যাসে— যেখানে নারীকে পণ্য করে ব্যবসা চালানো হয়। পুঁজিবাদী সভ্যতার নগ্নতা ফুটে ওঠে। আবার অন্যান্য বৈদগ্ধে চেনা ছকের মধ্যেই তিনি তার কাহিনির ক্যানভাসে সাজিয়ে তুলেছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মানুষের প্রেম, বিরহ, স্মৃতি, আবেগ, উদ্বেগ, দুঃখ, কৌতূহল, অসম্পূর্ণতা, নিষ্ঠুরতা, মালিন্য ও উত্তরণের কাহিনি। সব মিলিয়ে তিনি এক বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীল কথাসাহিত্যিক ছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিত সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন লেখক। তৎকালীন ও বর্তমান বাংলায় অবক্ষয়িত একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ছত্রাকের মতো গজিয়ে উঠেছে 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'। তথাকথিত আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সনাতনী পারিবারিক রীতির অবলুপ্তিকরণ

যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময় কর্মস্থানের অজুহাতে নাগরিক সমাজে ‘শান্তির নীড়’ গড়ে তোলার এক হাস্যময় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে হারিয়ে অন্যের কাছে নিজেকে হাজির করার প্রচেষ্টা কলুর চোখ বাঁধা বলদের পরিস্থিতি মাত্র। ‘আধুনিক’ হয়ে ওঠার অন্ধ প্রচেষ্টা মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে ঘুণপোকার মতো কুঁড়ে খায়। বাস্তুভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হওয়ার এক অট্টহাস্য অনুকরণ ও অনুসরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসিক যন্ত্রণা ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে নিপুণ শিল্পীর তুলির টানে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিতের লেখনীর স্বর নাগরিক। নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের অনিশ্চয়তা, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা ছিল তাঁর অন্যতম বিষয়বস্তু। সব সময়ই তিনি একটা সমান্তরাল বাস্তবতাকে তৈরী করেছিলেন। যেখানে বাস্তবের থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে মানুষের বিবেক। পরিবার ও সমাজের থেকেও তখন বড়ো হয়ে ওঠে নীতি ও দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, একজন খাঁটি ও সৎ মানুষের বিবেক। এইজন্য তাঁর চরিত্রগুলো বাস্তবতাকে এড়াতে না পেরে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। তখন তারা নিজেদের মতো করে পরিত্রাণের পথ খোঁজে। আর এই খুঁজতে গিয়েই তাদের উত্তরণ ঘটে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে আর্থসামাজিক কিছু ভ্রান্ত নীতির প্রবল চাপে মানুষের অসহায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাদের অপূরিত আকাঙ্ক্ষা, অপ্রাপ্তি, অভিমান, ব্যর্থতা এবং দুর্বলতাও। মানুষের মধ্যে থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অন্য এক মানুষকে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে নগরমনস্ক লেখক, যিনি আগাগোড়া নাগরিক জীবনের সমস্ত সংকট-নির্বেদ ও প্রতারণা কৃত্রিমতাকে নির্ভুলভাবে বিদ্ধ করতে পারেন। বিদ্রুপ করতে পারেন তাদের প্রতিবাদহীন জীবনযাত্রাকে।

নাগরিক মানুষের প্রতি দিব্যেন্দু পালিতের সত্তা যেন একটা জায়গায় কেন্দ্রিভূত হয়েছে। কাজেই তাঁর লেখার মধ্যে নাগরিক মানুষ আর তাদের সামাজিক এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বদলে যাওয়ার ছবি ফুটে উঠেছে। এ ছবি আবার প্রত্যেকের বিপন্নতার ছবি, নিঃসঙ্গতার ছবি। একটা মূল্যবোধ থেকে আর একটা মূল্যবোধে পৌঁছে দেওয়ার ইতিবৃত্ত। একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আর একটা সময়ের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেছে মানুষ। ফলে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দিব্যেন্দু পালিতের সমস্ত উপন্যাসই একটা বিশেষ সামাজিক

স্তরের। এই কারণেই তিনি সাধারণভাবে কিছু মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন। তাতে সামাজিক সমস্যা অবশ্যই কিছু এসেছিল। কিন্তু সামাজিক বা শ্রেণিগত সমস্যা কিংবা অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে যা উৎপন্ন হয় তার চাইতেও তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সম্পর্কের টানাপোড়েন বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। আর এই কারণেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো বেশি ভাবুক প্রকৃতিরও।

দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় লঘুতা একেবারেই নেই। তিনি সাহিত্যকে মনন এবং মানবিক চেতনার এক্সপ্রেশন হিসেবে বিচার করেন। একজন সচেতন লেখকের মতোই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্যবিষয়। সন্দেহ নেই, সবকিছুতেই তিনি নিজস্ব চিন্তায় সম্পূর্ণ একটি শিল্পকর্মের মর্যাদা দাবি করেন।